বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২৬ -এর কোস্ট ফাউন্ডেশন ও সিসিএনএফ-এর যৌথ অবস্থান পত্র

একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে শরণার্থী ও স্থানীয় সম্প্রদায়কে সম্মাননা প্রদান

মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পূর্ব শর্ত হিসেবে সীমান্ত নিরাপত্তা এবং সেবাবাহিনীকে দ্রুত শক্তিশালী করতে হবে

পটভূমি: বাংলাদেশ বর্তমানে ১১,৯৭,৪১১ জন রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে (৩১ মে ২০২৬ অনুযায়ী), যাদের বেশিরভাগই কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থিত ৩৩টি আশ্রয়শিবির এবং ভাসানচরে অবস্থান করছে। যদিও সীমান্ত অতিক্রম করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু হয়। তবে সবচেয়ে বড় ও ব্যাপকভাবে আগমন ঘটে ২০১৭ সালের আগস্টে। যখন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সামরিক বাহিনীর ব্যাপক ও পদ্ধতিগত সহিংসতার ফলে এ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশে নতুন করে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা প্রবেশ করেছে। এ ধরনের অনুপ্রবেশ মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গাদের অধিকার স্বীকারে অনিচ্ছা ও তাদের উপর চলমান নিপীড়নের কারণে ঘটছে। জাতিসংঘ এই সহিংসতাকে 'জাতিগত নির্মূলের আদর্শ উদাহরণ' এবং গণহত্যা হিসেবে বর্ণনা করেছে। বাংলাদেশ ১৯৫১ সালের জেনেভা কনভেনশন বা এর ১৯৬৭ সালের প্রোটোকলের স্বাক্ষর করেনি, ফলে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের 'শরণার্থী' হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় না। বরং তাদের 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক' হিসেবে অভিহিত করে।

বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের ঢল থামছেই না: জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর তথ্য অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যৌথ বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ কার্যক্রম (BIE)-এর মাধ্যমে ১,৪১,৫৩২ জন নতুন রোহিঙ্গা (৩৭,২৪৪টি পরিবার) শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের পরিবারভিত্তিক কার্ড প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর ২০২৪ সালের প্রথম ১০ মাসে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে ৪২,০০০-এর বেশি শিশুর জন্ম নথিভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএইচসিআর-এর যৌথ রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে রোহিঙ্গা জনসংখ্যা ছিল ১০,০৫,৬৭৫ জন এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১,৮২,৭৫৫ জনে। অর্থাৎ, এক বছরে মোট রোহিঙ্গা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৭৭,০৮০ জন। এই মোট বৃদ্ধির মধ্যে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন আগত রোহিঙ্গার সংখ্যা ছিল ১,৪১,৫৩২ জন। গত নয় বছরে কোন রোহিঙ্গাকে তো পাঠানো যায় নি, বরং নতুন করে ক্রমাগত রোহিঙ্গা প্রবেশ করছে।

প্রত্যাবাসনে অগ্রগতির অভাব: টেকসই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় নতুন রোহিঙ্গারা ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে থাকা শরণার্থী শিবির ও আশ্রয়দানকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করেছে। একই সময়ে তহবিল কমার কারণে মানবিক সংস্থাগুলো তাদের সহায়তা কার্যক্রম কমাতে বাধ্য হয়েছে।

নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে কোনো অর্থবহ অগ্রগতি না হওয়ায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ক্রমশ আশাহত হয়ে পড়ছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে- রোহিঙ্গা সংকটের একটি স্থায়ী ও টেকসই সমাধান অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়রেখা ও কৌশল কী?

হিউম্যানিটারিয়ান রিসেট রোডম্যাপের ভিশন: হিউম্যানিটারিয়ান রিসেট এমন একটি মানবিক ব্যবস্থা কল্পনা করে যা স্থানীয়ভাবে পরিচালিত, বৈশ্বিকভাবে সমর্থিত, সম্প্রদায়ভিত্তিক এবং সর্বাধিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিচালিত। মানবিক সংস্থাগুলো মানবিক নীতিমালা সমুন্নত রাখবে, মানবিক পরিসর রক্ষা করবে এবং বিশেষত নারী ও কন্যাশিশুদের সুরক্ষাকে কেন্দ্রস্থলে রাখবে। পুনরাবৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস, প্রতিষ্ঠানগত প্রতিযোগিতা বন্ধ এবং স্থানীয় নেতৃত্বাধীন সাড়াদান ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে আরও দ্রুত, ন্যায়সঙ্গত ও জবাবদিহিমূলক মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

হিউম্যানিটারিয়ান রিসেটের প্রধান অঙ্গীকারসমূহ:

• স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের চাহিদা, অগ্রাধিকার ও সক্ষমতার ভিত্তিতে সমন্বয় কাঠামো গড়ে তোলা এবং যেখানে সম্ভব স্থানীয় নেতৃত্ব নিশ্চিত করা।।

• জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের সঙ্গে স্থানীয় ও জাতীয় সংগঠনগুলোর আরও সমতাভিত্তিক, আস্থাপূর্ণ ও স্বীকৃতিনির্ভর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

• "**যতটা সম্ভব স্থানীয়, যতটা প্রয়োজন আন্তর্জাতিক**" নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং মানবিক কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে স্থানীয় নেতৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব, অর্থায়ন ও পরিমাপযোগ্য লোকালাইজেশন লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা।

• কান্ট্রি পুলড ফান্ডে অর্থায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা এবং জরুরি ত্রাণ সমন্বয়কারী (ERC)-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০ শতাংশ তহবিল স্থানীয় অংশীজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

কিন্তু বাস্তবে এসব প্রতিশ্রুতির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর বাস্তবায়নের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

জাতিসংঘের একক নেতৃত্ব এবং স্থানীয় এনজিওর সহ-নেতৃত্বের অনুপস্থিতি: রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন প্ল্যাটফর্ম (RCP)-এর নেতৃত্বে রয়েছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী (UNRC) এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ জাতিসংঘ কর্মকর্তা। খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, ওয়াশ, সুরক্ষা, শিক্ষা, জীবিকা উন্নয়নসহ সকল প্রধান সেক্টরের সমন্বয় প্রায় সম্পূর্ণভাবে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

রোহিঙ্গা সাড়া কার্যক্রমে মোট আটটি প্রধান সেক্টর রয়েছে। এর মধ্যে আটটিই জাতিসংঘ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। মাত্র একটি সেক্টরে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও (Save the Children) সহ-নেতৃত্বে রয়েছে। কোনো সেক্টরই জাতীয় বা স্থানীয় এনজিও দ্বারা পরিচালিত নয়। এই কাঠামো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে রোহিঙ্গা সাড়া কার্যক্রমের সমন্বয় ব্যবস্থা এখনো জাতিসংঘ সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যদিও বৈশ্বিক মানবিক প্রতিশ্রুতি এবং বিশেষ করে হিউম্যানিটারিয়ান রিসেটে লোকালাইজেশন ও স্থানীয় নেতৃত্বাধীন সাড়াদানের ওপর বারবার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তবুও কোনো স্থানীয় বা জাতীয় এনজিওকে এমনকি সহ-নেতৃত্বের ভূমিকাতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটি হিউম্যানিটারিয়ান রিসেটের নীতিগত প্রতিশ্রুতি এবং রোহিঙ্গা সাড়াদানে তার বাস্তবায়নের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান নির্দেশ করে।

UNOCHA পুলড ফান্ড হিউম্যানিটারিয়ান রিসেটের অঙ্গীকারের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় : সম্প্রতি জাতিসংঘ ওসিএইচএ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ তহবিল জাতিসংঘ পুলড ফান্ডের মাধ্যমে বরাদ্দ করেছে। এর মধ্যে ৯২ শতাংশ তহবিল জাতিসংঘ সংস্থাগুলো এবং ৮ শতাংশ আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ পেয়েছে। যদিও ওসিএইচএ স্থানীয় এনজিওসমূহের কাছে সরাসরি অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বাস্তবে কোনো স্থানীয় সংগঠন এই তহবিল পায়নি। পুলড ফান্ডের ৭০ শতাংশ স্থানীয় অংশীজনদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ঘোষিত হিউম্যানিটারিয়ান রিসেটের লক্ষ্যর সাথে সংগতিপূর্ণ না।

রোহিঙ্গা সাড়া কার্যক্রমে স্থানীয় সংগঠনসমূহের অবদান: কক্সবাজারের স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো রোহিঙ্গা মানবিক সাড়া কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে আসছে। তারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। কোস্ট দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে APRRN-এর সদস্য হিসেবে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শরণার্থী অধিকারের পক্ষে সোচ্চার রয়েছে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের পরপরই কোস্ট নিজস্ব অর্থায়নে উখিয়া ও টেকনাফে জীবনরক্ষাকারী ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করে, যার মধ্যে ছিল রান্না করা খাবার, বিশুদ্ধ পানি এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

২০১৮ সাল থেকে সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়নে কোস্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এছাড়া কোস্ট কক্সবাজার CSO NGO Forum (CCNF) প্রতিষ্ঠা করে, যা স্থানীয় সংগঠনগুলোর একটি জোট হিসেবে শরণার্থী অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। গত আট বছরে কোনো দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তা ছাড়াই কোস্ট এবং সিসিএনএফ রোহিঙ্গা

অধিকার উন্নয়নে অসংখ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, যা ইউএনএইচসিআর-এর ম্যান্ডেট বাস্তবায়নেও সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

জেআরপিতে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বরাদ্দ হ্রাস: দীর্ঘস্থায়ী রোহিঙ্গা সংকটের কারণে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চাপের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু ২০২৬ সালের যৌথ সাড়া পরিকল্পনা (JRP)-তে শিবিরের বাইরের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে কার্যত বাদ দেওয়া হয়েছে। উখিয়া ও টেকনাফে বসবাসরত ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। যদিও ২০১৯ সালের ১৫ জুলাই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (NGOAB) নির্দেশনা জারি করে বিদেশি অনুদানের ২৫-৩০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ রাখার কথা বলেছিল, বর্তমান জেআরপিতে তাদের জন্য মাত্র ৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সহমর্মিতা হ্রাস ও ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ: সংকটের শুরুতে যে সহমর্মিতা ও সংহতি দেখা গিয়েছিল, সময়ের সঙ্গে তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন শরণার্থী আগমন গ্রহণে অনীহা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে অপহরণ, চাঁদাবাজি, মুক্তিপণ দাবি ও সহিংসতার মতো নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি মনোযোগ কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যতীত অল্প কয়েকটি দেশই সংকটের টেকসই সমাধানে সক্রিয় আগ্রহ প্রদর্শন করছে।

সামাজিক সম্প্রীতি ও প্রকল্পভিত্তিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা: একটি নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক এবং টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উখিয়া ও টেকনাফে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সামাজিক সংহতি জোরদার করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে কার্যকর প্রকল্পভিত্তিক হস্তক্ষেপ গ্রহণ ও সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে কোস্ট -এর নেতৃত্বমূলক ভূমিকা: বাংলাদেশ সরকার ও এর কূটনৈতিক মিশনসমূহ ছাড়া খুব কম প্রতিষ্ঠানই ধারাবাহিকভাবে রোহিঙ্গা অধিকার এবং সংকটের স্থায়ী সমাধানের পক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৮ সাল থেকে কোস্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নীতিগত সংলাপ এগিয়ে নিতে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। কোস্ট প্রতিবছর ব্যাংককে অনুষ্ঠিত Regional Humanitarian Partnership Week (RHPW)-এ সেমিনার আয়োজন করে রোহিঙ্গা সাড়া কার্যক্রম ও লোকালাইজেশন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরেছে। এছাড়া ২০২৫ সালের European Humanitarian Forum (EHF)-এ অংশগ্রহণ করেছে এবং রোহিঙ্গা প্রবাসী প্রতিনিধি, মানবিক কর্মী ও নীতিনির্ধারকদের অংশগ্রহণে একাধিক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার আয়োজন করেছে।

এসব উদ্যোগের মাধ্যমে কোস্ট রোহিঙ্গাদের অধিকার সুরক্ষা, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অর্থবহ অংশগ্রহণ, মানবিক কার্যক্রমে শক্তিশালী লোকালাইজেশন এবং মিয়ানমারে নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের পক্ষে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ঐতিহাসিকভাবে কক্সবাজারের সীমান্ত অরক্ষিত ছিল: ১৭৮৪ সালে বার্মার আরাকান রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা হাজার হাজার শরণার্থীকে পুনর্বাসন করার জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে বর্তমান কক্সবাজার অঞ্চলে (তৎকালীন পালংকি) নিয়োগ দিয়েছিল। সেখানে তিনি আরাকানি শরণার্থী ও স্থানীয় রাখাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন এবং শরণার্থীদের বসতি স্থাপনের কাজ শুরু করেন। মিয়ানমারের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী তারা সক্রিয় আছে এবং এ সমস্ত জাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলমান রেখেছে এবং মিয়ানমার সরকারের মিয়ানমার জানতে সরকারের সাথে তাদের এই আন্দোলন চলমান আছে এবং আরাকান রাজ্যে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংঘাত চলমান আছে এর মধ্যে আরাকান আর্মি গঠন করে তারা মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চল দখল নেয়। পক্ষান্তরে রোহিঙ্গা কোন ভাগেই ছিল না, তারা কোন সশস্ত্র বা স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। ফলে তাদেরকে সহজের মায়ানমার থেকে বিতারিত করা সহজ হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে কক্সবাজারের সীমান্ত অরক্ষিত ছিল। এমনকি ব্রিটিশ আমলেও এখানে সেনাবাহিনী শক্তিশালী করা হয় নাই। কথিত আছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর যদি আধুনিক বিমান বাহিনী থাকতো তারা রোহিঙ্গা আগমনকে প্রতিরোধ করতে পারত। বাংলাদেশের সীমান্ত যদি সুরক্ষিত থাকতো তাহলে আমাদের এই সমস্যায় পড়তে হত না। কথিত আছে, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী মাদক (ইয়াবার) কারখানা তৈরি করেছে। তারা এই মাদক বিক্রির টাকা দিয়ে তাদের সেনাবাহিনী শক্তিশালী করেছে এবং তারা বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করেছে।

বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২৬ এ আমাদের দাবি:

১. **স্থানীয় এনজিও-র সংজ্ঞা পরিবর্তন** করতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটে স্থানীয় এনজিও তারা, যাদের উৎপত্তি কক্সবাজার জেলায় এবং যেসকল এনজিও-র প্রধান কক্সবাজারের সন্তান।

২. **যে সকল এনজিও কক্সবাজারের বাইরে থেকে এসেছে, ক্যাম্পে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে**, তাদেরকে চলে যেতে হবে। আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতি সংঘকে স্থানীয় এনজিওকে গুরত্ব দিয়ে তাদের সাথে অংশীদার করে ক্যাম্পের সকল কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. রোহিঙ্গা কো-অডিনেশন টিমে **স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যকে যুক্ত করতে হবে।** জেআরপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন এবং আরআরআরসি-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে বাদ দিয়ে স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

৪. আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কক্সবাজারে একটি এনজিও-র ৩১ টি এবং আরেকটি এনজিও-র ১৮ টি বেশি প্রকল্প রয়েছে যা সম্পদ বণ্টনে নিরপেক্ষতা ভঙ্গের সামিল। কোন একটি বা দুটি **এনজিওকে একচেটিয়া তহবিল প্রদান করে সাড়াদানে ভারসাম্যহীনতা বন্ধ করতে হবে।** অর্থায়নের কেন্দ্রীভূত কাঠামো বন্ধ করে অন্যান্য স্থানীয় এনজিওদের মধ্যে সুষম বন্টণ করতে হবে।

৫. কক্সবাজারের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য **"পরিবেশ পুনরুদ্ধার তহবিল"** গঠন করতে হবে। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিবর্তে নাফ নদীর পানি পরিশোধনের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে। পাশাপাশি বিকল্প পানির উৎস সৃষ্টি এবং পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করে কোন বর্জ্য ফেলে রাখা যাবে না। ক্যাম্পের পাশে ৩০০ একর নষ্ট জমি চাষাবাদের উপযোগী করতে হবে।

৬. **আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতি সংঘের কর্মীদেরকে স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান** করতে হবে যাতে তাদের কর্মীরা স্থানীয়করণ সূচক অনুযায়ী স্থানীয় এনজিওদের সাথে আচরণবিধি (Code of Conduct) অনুসরণ করতে পারে।

৭. তহবিল হ্রাস পাওয়ায়, **স্থানীয় এনজিওগুলিকে সাশ্রয়ী এবং টেকসই রোহিঙ্গা সাড়াদানে সরাসরি নিযুক্ত করা** উচিত।

৮. এই জুনে মালয়েশিয়া এবং চীনে আসন্ন সফরের সময়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রতি আমাদের চাওয়া হলো **রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনকে এগিয়ে নিতে মালয়েশিয়া, চীন এবং আসিয়ান দেশগুলির সাথে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার** করা।

৯. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১ তম অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান **রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায় এবং**

মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার নেতৃত্ব এবং কূটনীতিকে কাজে লাগাবেন।

১০. তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব হাকান ফিদান সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেন এবং ৬ জুন ২০২৬ তার প্রেস ব্রিফিং আমাদের জন্যও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে বৈদেশিক কূটনীতির জন্য একটি নতুন দরজা খুলে দেয়। **বাংলাদেশের উচিত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য এ ধরনের প্লাটফর্মগুলোকে ব্যবহার করা**।

১১. রোহিঙ্গা গণহত্যা ও দেশত্যাগের প্রায় এক দশক হতে চলল। নিরাপদ, স্বেচ্ছায় এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ সহ একটি "**যৌথ প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা (JRP 2.0)**" থাকা প্রয়োজন।

১২. আমরা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে **ক্যাম্পে শান্তি, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত** করতে, **নারী ও মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে** এবং **সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার এবং অস্ত্রের ব্যবসা প্রত্যাখ্যান করতে যৌথ ভাবে কাজ করার** আহ্বান জানাই।

১৩. রোহিঙ্গা যুবকদের **দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া** উচিত। সাথে **ভ্রমণ পাস এবং তাদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে জড়িত করার** জন্য ব্যাংকিং পরিষেবার সুযোগ দেয়া উচিত।

১৪. জাতিসংঘ এবং উন্নত দেশগুলিসহ **আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত মিয়ানমারের উপর কূটনৈতিক চাপ বৃদ্ধি এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা**।

১৫. **মায়ানমারের সাথে অস্ত্র ব্যবসা এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক সম্পর্ক** বজায় রাখা দেশগুলির তা **বন্ধ করা উচিত**, যা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রচেষ্টা এবং **মিয়ানমার জান্তার জবাবদিহিতার** জন্যও অন্তরায়।

১৬. **আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (ICJ) মায়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার গণহত্যা মামলার রায় ত্বরান্বিত করা** এবং রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা উচিত।

১৭. বাংলাদেশের মাদক চোরাচালান বন্ধ করতে এবং ব্লু ইকোনোমি সম্পদ আহরণে এবং কক্সবাজারের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে সীমান্তের সুরক্ষায় বাংলাদেশের **সেনাবাহিনী ও বিজিবিকে দ্রুত শক্তিশালী করা** প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীকে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ করতে হবে। ইউএনএইচসিআর এককভাবে কোনো দেশের শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করতে পারে না। তাই, বাংলাদেশ সরকার ও রোহিঙ্গা সম্পদায়কে নিজ দায়িত্বে প্রত্যাবাসনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

COAST Foundation, Metro Melody, House: 13, Road: 2, Shyamoli, Dhaka-1207, Bangladesh.
Phone: +88 02- 4102 5889, 5890, 5891; Email: info@coastbd.net, Web: https://bd-cso-ngo.net, www.coastbd.net